facebook/@maktabatuttalamij

সোনার গাঁর সোনার মানুষ

শাহেদ আলী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

facebook/@maktabatuttalamij

সোনার গাঁর সোনার মানুষ
শাহেদ আলী
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
ইফা প্রকাশনা : ৫৬৯/৪
ইফা গ্রন্থাগার : ৯২৩.৫৪৯২
ISBN : 984-06-0129-6
পঞ্চম সংস্করণ (উন্নয়ন)
জুন ২০১৩
আষাঢ় ১৪২০
শাবান ১৪৩৪
মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল
প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫
প্রচ্ছদ :
হাশেম খান
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুঃ হারুনুর রশিদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা।

SONAR GA'A SONAR MANUSH (Life-sketch of Sultan Gyias Uddin Azam Shah) : Written by Shahed Ali for children in Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director Islamic Publican Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 June : 2013

Website : www islamicfoundation.org.bd
E-mail : islamicfoundationbd @yahoo.Com

Price: Tk. 50.00; US Dollar : 2.00

facebook/@maktabatuttalamij

বাংলাদেশের
যাদের
গর্ব ও গৌরবের

facebook/@maktabatuttalamij

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা যে কোন জাতিকে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে চলার সাহস যোগায়। সুদূর অতীতের রাজা-বাদশাহ্, কবি-সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণীদের ইতিহাস আমাদের তরুণ সমাজকে যেমন জাতির ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিয়ে থাকে তেমনি তা সুগম করে থাকে আমাদের নতুন প্রজন্মের চলার পথকে। এ হচ্ছে জাতির উজ্জীবনী শক্তি।

প্রখ্যাত লেখক ও সুসাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলী প্রণীত 'সোনার গাঁর সোনার মানুষ' পুস্তিকা আমাদের শিশু-কিশোরদের জন্যে একটি মূল্যবান সওগাত। আজ থেকে প্রায় ছয়শ' বছর আগেকার বাংলাদেশের অধিপতি সুলতান গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্‌র উপর লেখা এই বইয়ের পঞ্চম সংস্করণ কোমলমতি শিশুদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা গর্ববোধ করছি। নতুন প্রজন্ম আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান বোধে উজ্জীবিত হোক এই কামনা করি।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

facebook/@maktabatuttalamij

লেখকের কথা

মানুষ ইতিহাস খোঁজে, ইতিহাস পড়ে, কেন? ইতিহাস তো অতীতের কথা। কিন্তু তাই বলে বর্তমান কি অতীতের সাথে সম্পর্কহীন? তা নয়।

নদীর স্রোতের যেমন উৎস থাকে তেমনি প্রত্যেক জাতির একটি উৎস থাকে। সেই উৎস থেকে স্রোত বয়ে চলে এঁকেবেঁকে তার গন্তব্যের দিকে। নদীর পারে আমরা যেখানে ঘর বাঁধি, নদী কি কেবল সেখানেই? তা নয়। উজানেও নদী আছে। এই উজানটাই একটা জাতির জীবনে তার অতীত, তার ইতিহাস, আর ভাটি তার ভবিষ্যত। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত বিচ্ছিন্ন নয়–একই ধারায় প্রবাহিত।

এজন্যে যে কোনো জাতি তার অতীতের খবর রাখে, অতীত থেকে প্রেরণা আর পাথেয় সংগ্রহ করে। অতীত ইতিহাসের মহৎ ঘটনা সব সময়ই জাতিকে অনুপ্রাণিত করে।

বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এর আগে বাংলাদেশ কখনো ছিলো স্বাধীন, কখনো ছিলো অধীন। সুলতানী আমলে বাংলাদেশ ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন- পুরো দু'শো বছর। দিল্লীর আধিপত্যের সম্পূর্ণ বাইরে সেই সময়েই ঢাকার অদূরে আমাদের সোনার গাঁ থেকে বাংলাদেশে রাজত্ব করতেন একজন গুণী মানুষ, যাঁকে নিয়ে যে কোনো দেশ, যে কোনো জাতি গর্ববোধ করতে পারে। এই যে মানুষটি, যাঁর রাজ্যসীমা ছিলো আমাদের বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবংগ, কুচবিহার আর আসামের একটা অংশ নিয়ে, যিনি জ্ঞানী-গুণীদের কদর করতেন, আউলিয়া-দরবেশদের সংগ ভালবাসতেন, নিজে কবিতা লিখতেন, গজল লিখতেন, দেশ-বিদেশের কবিদের খবর রাখতেন, তাঁদের সংগে পত্রালাপ করতেন, রাজা-প্রজা সকলের জন্যে এক আইন —ইসলামের এই নীতি মেনে চলতেন, যাঁর রাজ্যে মানুষের সুখের সীমা ছিলো না, তাঁরই কথা ছোটদের উপযোগী করে লেখা হয়েছে এই পুস্তকে। আমাদের কতো গর্বের বিষয় যে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় শ' বছর আগে এই সুলতান সোনার গাঁ থেকে অঢেল সোনার মোহর পাঠিয়েছিলেন আরব দেশে—সেখানে মাদ্‌রাসা করার জন্যে, সরাইখানা তৈরি করার জন্যে এবং খাল খনন করে পানির অভাব দূর করার জন্যে।

সোনার গাঁর সোনার মানুষ গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্‌র উপর লেখা এ বই আমার দেশের শিশুদের হাতে দিতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি। আমার বিশ্বাস, এ বইটি তাদের ভালো লাগবে, তাদের মনে গর্ব ও আত্মসম্মানবোধ জাগাতে সাহায্য করবে।

শাহরিয়ার [signature]

facebook/@maktabatuttalamij

খলীফা–রাজা–সুলতান

সুলতানের নাম সিকান্দার শাহ্।
কোথাকার সুলতান?
আরব দেশের?
না।
ইরানের?
না।
তুরস্কের?
না।
হিন্দুস্তানের?
তাও না।
তবে?
বাংলাদেশের সুলতান।

তোমরা হয়তো প্রশ্ন করবে বাংলাদেশে আবার সুলতান হলো কখন? হ্যাঁ, বাংলাদেশে অনেক সুলতান ছিলেন। সেই যে বখতিয়ার খিলজী সতেরোজন

facebook/@maktabatuttalamij

ঘোড়-সওয়ার নিয়ে এলেন, বাংলাদেশ জয় করলেন-সে আজ হতে কতো বছর আগের কথা? প্রায় আট শ' বছর হলো তো। এরপর এদেশে আরো অনেক সুলতান এসেছেন—জন্মেছেন।

সুলতান কাকে বলে?

বাংলায় বলে রাজা, আরবীতে বলে সুলতান, ফারসীতে বলে বাদশাহ্। তবে তফাৎ আছে। কেবল মুসলমান রাজাকেই সুলতান বলা হয়, বাদশাহ বলা হয়।

ইসলামের শুরুতে কিন্তু সুলতান বা বাদশাহ বলতে কেউ ছিলো না। তখন ছিলেন খলীফা। খলীফা মানে প্রতিনিধি। তিনি যেমন আল্লাহ্র প্রতিনিধি, তেমনি জনগণেরও প্রতিনিধি। তিনি জনগণের প্রভু নন, খাদিম। গরীব মানুষেরা যে ধরনের ঘরবাড়িতে থাকে খলীফারাও সেই রকমের ঘরে থাকতেন। গরীবদের মতো কাপড়-চোপড় পরতেন, খাবার খেতেন। গরীবদের যিনি খাদিম তিনি বিলাসী জীবন-যাপন করবেন কেমন করে? তাঁরা বেতন নিতেন খিলাফতের সবচেয়ে ছোটো চাকুরেদের বেতনের সমান।

ইসলামী রাষ্ট্রকেই বলা হয় খিলাফত। খলীফার ছেলে খলীফা হতে পারে না। কিন্তু রাজার ছেলে রাজা হয়, সুলতানের ছেলে সুলতান হয়। মহানবী (স)-র ইন্তিকালের পর, পরপর চারজন খলীফা হলেন। তাঁদের নাম তো তোমরা জানোই। হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) আর হযরত আলী (রা)। হযরত আলী (রা)-র পরই অবস্থা পাল্টে গেলো। খলীফারা আর প্রতিনিধি রইলেন না, খাদিম রইলেন না। আশপাশের অমুসলমান দেশগুলির দেখাদেখি মুসলমান দেশেও রাজতন্ত্র কায়েম হলো।

রাজতন্ত্র মানে রাজাই সব। তিনিই সব কিছুর মালিক। তাঁর হুকুমই আইন। তিনি মরলে তাঁর ছেলেই বসবে সিংহাসনে। মুসলমান দেশের রাজারাই হলেন সুলতান কিংবা বাদশাহ্। তবে তাঁদের অনেকেই ইসলামী আইন-কানূন মেনে চলেন। ইসলামী আইন-কানূন মতে দেশ চালাতে চেষ্টা করেন।

facebook/@maktabatuttalamij

বাংলার সুলতান সিকান্দার শাহ্

এ রকম একজন সুলতান সিকান্দার শাহ্। বাংলার সুলতান। অনেক বড়ো তাঁর রাজ্য।

সিকান্দারের পিতার নাম ইলিয়াস শাহ্। পুরো নাম শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্। ইলিয়াস শাহ্ কেবল বাংলার সুলতান ছিলেন না। তিনি নেপাল জয় করেছিলেন, বিহারের হাজীপুর জয় করেছিলেন, চম্পারণ, গোরখপুর, কাশীও জয় করেছিলেন। তা হলেই আন্দাজ করে দেখো তাঁর রাজ্য ছিলো কতো বড়ো!

সেই সময়ে দিল্লীর সম্রাট ছিলেন ফিরোজ শাহ্ তোঘলক। যে রাজার

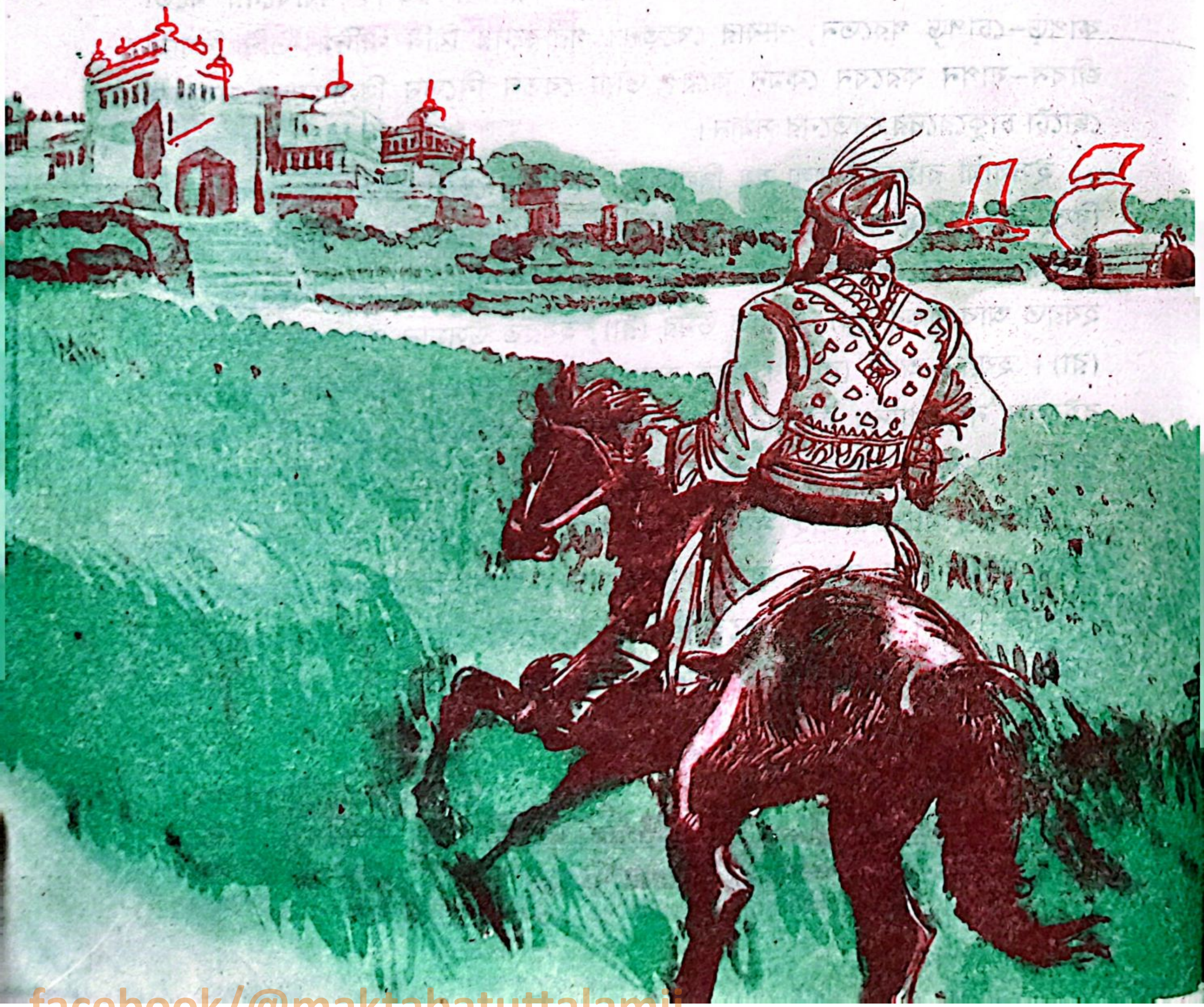

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

অধীনে অনেক রাজ্য থাকে তাঁকেই বলে সম্রাট। পর রাজ্যের উপর সম্রাটদের ভীষণ লোভ। বাংলাদেশের উপর চিরকালই দিল্লীর খুব লোভ। ফিরোজ শাহ্ চাইলেন—বাংলাদেশ দখল করে নেবেন।

ফিরোজ শাহ্‌র লোক-লশ্‌কর বেশুমার, হাতী-ঘোড়া অসংখ্য। তিনি দিল্লীর সম্রাট। এই লোক-লশ্‌কর আর হাতী-ঘোড়া নিয়ে তিনি বেরোলেন।

কি জন্যে?

না, ইলিয়াস শাহ্‌র নিকট থেকে বাংলাদেশ কেড়ে নেবেন। তাঁর সাম্রাজ্যের পুব সীমানা ঠেলে দেবেন ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত।

সে কি আজকের কথা? প্রায় সাড়ে ছয় শ' বছর আগের কথা। কিন্তু ফিরোজ শাহ্ তেমন সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। লড়াই হলো বটে, লোক-লশ্‌করও মারা গেলো, কিন্তু বাংলাদেশ তিনি জয় করতে পারলেন না।

ইলিয়াস শাহ্ বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে লাগলেন।

সেই ইলিয়াস শাহ্‌র মৃত্যু হলো একদিন। তখন তাঁর পুত্র সিকান্দার সুলতান হলেন। সুলতান হয়েই তিনি ঘোষণা করলেন ঃ আমি দয়া করবো সকলের প্রতি, সবার প্রতি করবো ইনসাফ।

যে শাসক মানুষের প্রতি দয়া করেন, ইনসাফ করেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি খুশি হন। তাঁর উপর আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয়। তাই না সিকান্দার শাহ্ এক লাগা তিরিশ বছর সুলতান ছিলেন। তাঁর রাজ্যে সকলের কতো সুখ ছিলো, কতো শান্তি ছিলো।

সিকান্দার শাহ্ জ্ঞানী-গুণীদের খুব তা'জীম করতেন। কামিল-দরবেশের খুব সম্মান করতেন। সৎ লোকের সংগ ভালবাসতেন। তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর দালান-কোঠা বানিয়েছিলেন। আদিনার বিখ্যাত মসজিদ তাঁরই কীর্তি। ভারতের মালদহ জেলায় গেলে তোমরা দেখতে পাবে এই চমৎকার মসজিদের ধ্বংসাবশেষ।

facebook/@maktabatuttalamij

পর রাজ্যের উপর সম্রাটদের লোভ মরেও মরে না। সুযোগ পেলেই ওরা অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের উপরও দিল্লীর সব সময়ই লোভ। বাংলাদেশ সোনার দেশ। বেহেশ্‌তের বর্ণনার সংগে মিল আছে সবুজ-শ্যামল এই দেশের।

দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ্‌ আবার চাইলেন—বাংলাদেশ জয় করে নেবেন, কিন্তু এবারও ব্যর্থ হলেন, বাংলাদেশ জয় করা সম্ভব হলো না।

ফিরোজ শাহ্‌ তখন কি করলেন? বললেন ঃ মুসলমানে মুসলমানে লড়াই ঠিক নয়। তিনি সিকান্দার শাহ্‌র সংগে সন্ধি করবেন। আসলেও তাই হলো। বাংলার সুলতান আর দিল্লীর সম্রাটের মধ্যে সন্ধি হলো।

দিল্লীর সম্রাট বললেন ঃ আর লড়াই নয়; এখন থেকে বাংলার সুলতান সিকান্দারকে আমি আমার ভাইপো বলে গণ্য করবো।

হলোও তাই। যতদিন তাঁরা দু'জন বেঁচেছিলেন তাঁদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ ছিলো এই সম্পর্ক। সম্রাট হাতী-ঘোড়া, আরো নানা উপহার পাঠাতেন বাংলার সুলতানের কাছে। সুলতানও পাঠাতেন উপহার সম্রাটের কাছে।

ছোট বেগমের একটি পুত্র

এই সিকান্দার শাহ্‌র দুই বেগম। বড় বেগমের সতেরোটি পুত্র আর ছোটো বেগমের মাত্র একটি।

কিন্তু মায়ের একমাত্র পুত্র হলে কি হবে! তার অনেক গুণ! বাচ্চা-বয়স থেকেই তার মাঝে এই গুণগুলি ফুটে উঠতে থাকে সুগন্ধি ফুলের মতো। সেই খোশবুতে তার আম্মা মুগ্ধ, আব্বা মুগ্ধ-সবাই মুগ্ধ।

এই পুত্রটিকে নিয়ে সিকান্দার শাহ্‌র অনেক আশা, অনেক ভরসা। তাঁর বিশাল রাজ্য-এ রাজ্য চালাবার মতো গুণ তাঁর এই পুত্রের মধ্যে আছে।

facebook/@maktabatuttalamij

যে ছেলে গুণী, যে বুদ্ধিমান, যার আদব-আখলাক ভালো, তাকে সব বাপ-মাই আদর করেন। সিকান্দার শাহ্ও তাঁর এই ছেলেটিকে খুব আদর করেন, স্নেহ করেন।

বড়ো বেগম কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেবল জ্বলেন। সুলতানের উপর তিনি খুব নাখোশ। সুলতানের কাছে তাঁর সতেরোটি ছেলের কোন কদর নেই, ছোট বেগমের পুত্রকে নিয়ে মেতে আছেন। মা হয়ে তিনি কী করে তা বরদাশত করেন। অসহ্য ! অসহ্য !

বড়ো বেগম মনে মনে ফন্দি আঁটলেন, সুলতানকে বোঝাতে হবে—দুধ-কলা দিয়ে তিনি কেউটে সাপ পুষছেন। বড়ো হয়ে এই সাপ একদিন তাঁর মাথায় ছোবল মারবে।

একদিন অন্দর মহলে সুলতানের পাশে বসে বড়ো বেগম বললেন ঃ জাহাঁপনা, সময় থাকতে হুঁশিয়ার হোন।

সুলতান বড়ো বেগমের মতিগতির খবর রাখতেন। বড়ো বেগমের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা তিনি জানেন। কিন্তু সুলতান কেবল বুদ্ধিমানই নন, তিনি রসিকও। তিনি যেনো খুব ভয় পেয়ে গেছেন এমনিভাবে বললেন—কি ব্যাপার বেগম ? রাজ্যের উপর কোনো হামলা হতে যাচ্ছে নাকি ?

বড়ো বেগম বললেন ঃ হ্যাঁ জাহাঁপনা তা-ই, তবে দুশমন বাইরের নয়, আপনার ঘরেই সে বেড়ে উঠছে।

সুলতান হঠাৎ চমকে ওঠার ভান করেন ঃ কে—কে আমার এই দুশমন ?

ঃ জাহাঁপনা কিছুই বুঝেন না, বড়ো বেগম বলেন, আপনার পেয়ারের ছোটো বেগমের পুত্রটিই আপনার সেই দুশমন—আপনার সেই কাল !

সুলতান অভিনয় করেন—তিনি যেনো আসমান থেকে পড়েছেন ঃ বলছো কি বড়ো বেগম !

ঃ ঠিকই বলছি, বড়ো বেগম বললেন, হয় একে কয়েদ করে জেলখানায় রেখে দিন, না হয় এর চোখ দুটি উপড়ে ফেলুন।

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

সিকান্দার শাহ্ এবার তাঁর নিজ মূর্তি ধারণ করলেন, বললেন ঃ চুপ করো বড়ো বেগম। খবরদার, এ কথা আর মুখ থেকে বের করো না।

বেগম তখন বললেন ঃ জাহাঁপনার ভালো চাই বলেই একথা জানালাম।

সিকান্দার শাহ্ বললেন ঃ এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমার উপর ছেড়ে দাও।

সিকান্দার শাহ্ ছোটো বেগমের পুত্রকে ভালো করে চিনেন। তার উপরই রাজ্যভার ছেড়ে দেবেন, এ তাঁর বহুদিনের ইচ্ছা। কতো বুদ্ধিমান আর সাহসী তাঁর এই ছেলে। এই গুণী পুত্রের হাতে যদি তাঁর মৃত্যু থেকেই থাকে তবে আল্লাহ্‌র সেই ইচ্ছাই পূরণ হোক। সে যদি ইনসাফ থেকে, কর্তব্য থেকে সরে পড়ে তার শাস্তি আল্লাহ্ই দেবেন।

এরপর সিকান্দার শাহ্ কি করলেন ? না, ছোটো বেগমের পুত্রকে ডেকে বললেন–নাও বাবা, আজ থেকে রাজ্য তোমার—তোমাকে সব ছেড়ে দিলাম।

এ কথা শুনে ছোটো বেগমের ছেলেটি যেনো আসমান থেকে পড়লো ! আব্বা বেঁচে থাকতে সে হবে সুলতান ! এ কেমন করে সম্ভব ? সে বললো, না জাহাঁপনা, এ হতে পারে না। আমি সুলতান হতে চাই না।

সুলতান তাঁর পুত্রকে জানেন, তার মনের খবর তিনি রাখেন। এ ধরনের জবাবই তিনি আশা করছিলেন পুত্রের কাছ থেকে।

এদিকে বড়ো বেগম ভাবলেন, ছেলেটি কী বেয়াদব! সুলতানের কথা শুনছে না! সুলতানকে তিনি বললেন ঃ দেখলেন তো, আপনার পেয়ারের ছেলে আপনার কতো অবাধ্য! সে আপনার নিকট থেকে দান গ্রহণ করবে না! আসলে তার মতলব খারাপ। সে একদিন জোর করে রাজ্য ছিনিয়ে নেবে।

সুলতান এসব কথা বিশ্বাস করেন না। কখনো কখনো যে তাঁর মনে সন্দেহ না হয় তা-ও নয়। তখন তিনি নিজেই শরম পান। বাপ হয়ে কি করে তিনি পুত্রকে সন্দেহ করতে পারেন!

facebook/@maktabatuttalamij

তরুণ শাহ্‌যাদা সকলের প্রিয়। রাজ্যের সকল আমীর-ওমরাহর সাথে তাঁর খুব ভাব। সকলেই তাঁর তা'রীফ করে। এজন্যে সুলতানের কতো আনন্দ।

কিন্তু বড়ো বেগম এরও ভুল ব্যাখ্যা করেন সুলতানের কাছে। বলেন : দেখছেন তো, কেউ আর আপনার তা'রীফ করে না, কেবল আপনার পুত্রেরই তা'রীফ করে। তলে তলে সবাই মিলে আপনার বিরুদ্ধে জোট পাকাচ্ছে। ওরা আপনার পেয়ারের পুত্রকে সুলতান বানাতে চায়।

এভাবে রাত নেই, দিন নেই, সুযোগ পেলেই বড়ো বেগম সুলতানের কানে কুমন্ত্রণা দিতে থাকেন। যে সন্দেহ তিনি মনে ঠাঁই দিতে চান না, সেই সন্দেহই সুলতানের মনে দানা বাঁধতে থাকে।

শাহ্‌যাদা লক্ষ্য করে, আব্বার মুখে আজকাল আর হাসিখুশি ভাব নেই। তিনি আর আগের মতো তাকে স্নেহ করেন না। তার সংগে কথা বলেন না।

এদিকে আমীর-ওমরাহ্‌দের কেউ কেউ শাহ্‌যাদাকে বোঝাতে লাগলো, সুলতান বড়ো বেগমের যাদুতে পড়েছেন। সুলতান তাঁকে দুশমন মনে করেন। যে কোনদিন তাঁকে বন্দী করা হতে পারে। তখন যে শাহ্‌যাদার কি পরিণাম হবে কেউ বলতে পারে না। বড়ো বেগম চান—তাঁকে বন্দী করে তাঁর চোখ দু'টি তুলে ফেলা হোক।

ছোটো বেগমের পুত্রটি ভাবলো, এখানে আর কিছুতেই থাকা যায় না। একদিন সুযোগ বুঝে শিকারের উসিলায় বাড়ি থেকে দিলো চম্পট।

পালিয়ে কোথায় গেলো জানো? সোনার গাঁয়ে।

কোন্ সোনার গাঁয়ে? এই যে ঢাকার অদূরে সোনার গাঁ। এখানে এসে আস্তানা গাড়লো সেই তরুণ। আজ ঢাকা যেমন বাংলাদেশের রাজধানী, তেমনি সোনার গাঁ ছিলো তখন বাংলার রাজধানী। সোনার গাঁ ছিলো দেয়াল দিয়ে ঘেরা, রাজধানীর শহরতলি ছিলো অনেক। সুলতানের মহল এবং ছোটো বড়ো সকল উযীর-নাযীর কর্মচারীর বাসভবন ছিলো শহরের মধ্যেই।

facebook/@maktabatuttalamij

ছোটো বেগমের পুত্রটির মনে বড় ভয়, যে কোনো সময় তার বিপদ হতে পারে। বিপদের মোকাবিলা করার জন্যে চাই শক্তি, চাই ফৌজ। প্লান করে, পরিকল্পনা করে সে কাজে লেগে গেলো—ফৌজ গড়ে তুলবে! গড়েও তুললো বিশাল ফৌজ।

গোপনে গোপনে সুলতানের চরেরা ছড়িয়ে পড়লো সোনার গাঁ এলাকায়। ছোট বেগমের পুত্রটি কি করছে তা তারা চোখে দেখলো। অমন বিশাল বাহিনী গড়ে তোলার মানে কি? শিকারের উসিলায় পালিয়ে এসেছে, আর বিরাট এক ফৌজ গড়ে তুলেছে। লোকের কাছ থেকে খাজনা আদায় করছে। ভাব-সাব এমন যে নিজেই একজন সুলতান। এক রাজ্যের মধ্যে আরেক রাজ্য। এতো প্রকাশ্য বিদ্রোহ।

ষড়যন্ত্রের শিকার

তারা গিয়ে সুলতানকে বোঝালো, রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ চলতে দেয়া ঠিক নয়। এতে প্রজাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। সুলতানের ক্ষমতায় তাদের বিশ্বাস টুটে যাবে। তখন সুযোগ বুঝে সবাই বিদ্রোহীর দলে নাম লেখাবে। এর ফলে একদিন রাজ্য ভেঙে পড়বে।

সুলতানের মনে একথা খুব দাগ কাটলো। কথা তো ঠিক। বিদ্রোহ শুরুতেই দমন না করলে মুশ্‌কিল হবে। দেশের সব জায়গায় বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়বে।

সুলতানের তাহলে কি করা উচিত। না, তিনি বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করবেন, আর বাড়তে দেবেন না।

সুলতানের হুকুম/দেশজুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। সিকান্দার শাহ্ বীর পুরুষ। হাতী-ঘোড়া, লোক-লশ্‌কর তাঁর বেশুমার। তাদের সাথে যোগ দিলো

facebook/@maktabatuttalamij

নতুন আরো হাজার হাজার সিপাই। রব উঠলো, সোনার গাঁ চলো। বিদ্রোহীকে খতম করো। সোনার গাঁ দখল করো।

সুলতানের ফৌজ সোনার গাঁ রওয়ানা হলো।

ছোটো বেগমের পুত্র সুলতান সিকান্দার শাহ্র পুত্র। বীরের বেটা বীর। সে ভাবলো, এই সুযোগে আব্বাকে দেখাতে হবে—সে পিতার উপযুক্ত পুত্র, সে কাপুরুষ নয়, সে মুখোমুখি লড়বে।

দুই ফৌজ মুখোমুখি হলো—গোয়ালপাড়া প্রান্তরে। ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জের কাছেই নাকি ছিলো এই গোয়ালপাড়া। এখন তার নাম-নিশানা নেই। নদীতে ধুয়েমুছে নিয়ে গেছে।

শাহ্জাদা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তার ফৌজকে সম্বোধন করে বললো ঃ লড়াই না করে আমরা পারছি না—আমরা লড়াই করবো। কিন্তু খবরদার, সুলতানের উপর কেউ হাত তুলতে পারবে না। তাঁর প্রতি কেউ অসম্মান করবে না। যুদ্ধে হারজিত আছেই। যদি সুলতান হারেন, তাঁকে আমার সামনে এনে হাযির করবে সসম্মানে।

সেই গোয়ালপাড়ার ধূ-ধূ ময়দানে বাপ-বেটায় মোকাবিলা হলো, তুমুল লড়াই চললো।

লড়াইয়ের ময়দানে কে কাকে চেনে বলো ? সবাই তখন খুনের নেশায় পাগল। একটা লোক না করলো কী—যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে একবার বর্শা ছুঁড়ে মারলো সিকান্দার শাহ্র দিকে। লোকটা চিনতো না সিকান্দার শাহ্কে। সেই বর্শা গিয়ে বিঁধলো সিকান্দার শাহ্র বুকে।

যুদ্ধের ময়দানে একপাশে ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ তদারক করছিলো ছোটো বেগমের পুত্র। তার কাছে খবর গেলো—সিকান্দার শাহ্ যখম হয়ে পড়ে আছেন যমীনে।

সর্বনাশ ! এ কী হলো ! ছোটো বেগমের পুত্র তো চায়নি যে তার পিতার অসম্মান হোক, তাঁর গায়ে কোনো আঘাত লাগুক।

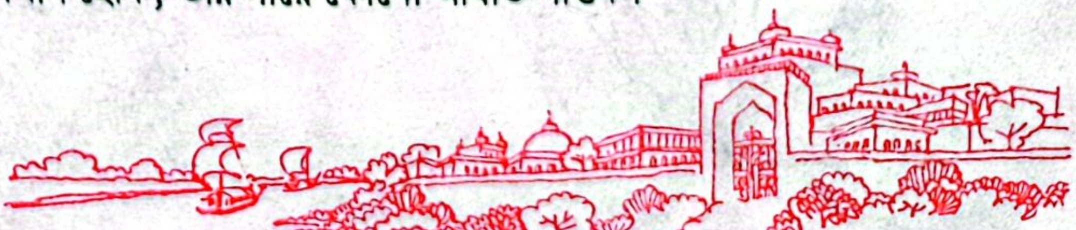

facebook/@maktabatuttalamij

পাগলের মতো ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটলো সে। পিতার নিকট গিয়ে সে লাফ দিয়ে নামলো ঘোড়া থেকে, তারপর যমীনে বসে পিতার মাথা কোলে তুলে নিয়ে সে কাঁদতে লাগলো, বললো, আব্বুজী ! চোখ মেলুন, আপনার গিয়াস।

সুলতান চোখ মেললেন। গিয়াসের চোখ হতে তখন গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। আমি যা চাইনি তা–ই হয়ে গেছে আব্বুজী! আমাকে বলুন, আপনার শেষ ইচ্ছা কী, শেষ নসীহত কী। আপনি যা–ই বলবেন আমি তা করবো।

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

বর্শা বেঁধা সিকান্দার শাহ্‌র মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো। গিয়াসের মাথায় একটা হাত রেখে আস্তে আস্তে বললেন ঃ আমার জীবনে যা করবার ছিলো সবই করেছি, আর কিছুই আমার করবার নেই। তোমার হাতে এ রাজ্য তুলে দেবো, এ ছিলো আমার স্বপ্ন। রাজ্য আজ হতে তোমার হলো। সুলতান হিসাবে তোমার তরক্কী হোক, উন্নতি হোক—আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া করি।

বিশাল এক রাজ্যের সুলতান সিকান্দার শাহ্ এর পর চোখ মুদলেন গোয়াল পাড়ার প্রান্তরে, ছোটো বেগমের পুত্রের কোলে মাথা রেখে।

গিয়াস এরপর আমলাদের ডেকে বললেন—সুলতানের দাফন-কাফনের ইন্তেজাম করতে হবে সুলতানী শান-শওকতের সংগে। দাফন-কাফনের পরই তিনি ঘোড়া হাঁকালেন পাণ্ডুয়ার দিকে। কোথায় সেই পাণ্ডুয়া ? ভারতের পশ্চিম বংগের মালদহ জেলায় ; এই পাণ্ডুয়া ছিলো তখন সুলতান সিকান্দার শাহ্‌র রাজধানী।

কবি সুলতান গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ

এখন হতে ছোটো বেগমের এই পুত্রটি বাংলার সুলতান। সুলতান গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্।

তখন বাংলাদেশের উত্তর সীমা ছিলো কামতা রাজ্য আর পূর্ব সীমা কামরূপ রাজ্য। এখন যাকে কুচবিহার বলে তাকেই বলা হতো কামতা রাজ্য। আর কামরূপ রাজ্য বলতে বোঝাতো আসামকে। তা হলে বুঝতেই পারছো, আমাদের বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবংগ, কুচবিহার আর আসামের একটা অংশ নিয়ে ছিলো গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্’র বিশাল রাজ্য—তখনকার বাংলাদেশ।

কিন্তু হলে কী হবে, তাঁর মেজাজ-মর্জিই আলাদা। তিনি তাঁর দাদু ইলিয়াস শাহ্ আর আব্বা সিকান্দার শাহ্‌র মতো যুদ্ধ-বিগ্রহ তেমন ভালোবাসেন না।

facebook/@maktabatuttalamij

তা হলে তিনি কী ভালোবাসেন? তিনি জ্ঞানী-গুণীদের সংগ ভালোবাসেন, দরবেশদের সংগ ভালোবাসেন, ভালোবাসেন কবি-সাহিত্যিকদের।

আর তিনি নিজেও কবিতা লেখেন, গযল লেখেন।

একবার কবিতার একটি পদ লিখে ভারী মুশকিলে পড়লেন, কিছুতেই দ্বিতীয় পদটি মেলাতে পারছেন না। বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু মনের মতো কবিতার চরণ খুঁজে পেলেন না।

কী আর করেন কবি ! ইরান দেশে তখন এক কবি ছিলেন—গিয়াস উদ্‌দীন তাঁর কথা জানতেন। কোথায় বাংলাদেশ আর কোথায় ইরান! এখন তো উড়োজাহাজে একদিনে যাওয়া যায়। তখন বাংলাদেশ থেকে ইরান যেতে লাগতো এক বছরেরও বেশি। সেই ইরানের এক কবির কাছে লোক পাঠালেন তিনি।

কেন পাঠালেন ? না, ইরানের কবি দ্বিতীয় চরণটি লিখে দেবেন। পদ মিলিয়ে দিয়ে তাঁকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করবেন।

গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্ চিঠি লিখলেন সেই কবির কাছে। সংগে দিলেন তাঁর রচিত কবিতার চরণটি। অনুরোধ ঃ ইরানের কবি যেনো বাংলাদেশের কবিকে কবিতার একটি চরণ উপহার দিয়ে সরফরায করেন—ধন্য করেন।

কে সেই ইরানের কবি ? সেই কবির নাম হাফিজ। অমর কবি হাফিজ। দুনিয়ার সকল কালের সেরা কবিদের মধ্যে এই হাফিজ হলেন একজন। তাঁর কবিতার তরজমা হয়েছে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায়। আমাদের কবি নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতা তরজমা করেছিলেন বাংলায়। রবীন্দ্রনাথের শৈশবে তাঁর পিতা ও পরিবারের অন্যদের মুখে মুখে ফিরতো এই হাফিজের কবিতার চরণ।

ইরানের এই কবিও বাংলাদেশের এই সুলতানের খবর রাখতেন। তিনি চিঠি পেয়ে ভীষণ খুশি হলেন। কবিতার দ্বিতীয় চরণটি তো সংগে সংগে লিখে দিলেনই, নিজে একটি লম্বা কবিতাও লিখলেন বাংলাদেশের সুলতানের উদ্দেশে।

facebook/@maktabatuttalamij

কবি–সুলতান গিয়াস উদ্‌দীন কবি হাফিজকে দাওয়াত করেছিলেন বাংলাদেশে। তিনি আসতে পারেন নি; এজন্যে দুঃখ করেছেন এই কবি আর কল্পনায় তৈরি করেছেন বাংলাদেশের এক অপরূপ ছবি। এ কেবল ইতিহাসের কথা নয়, হাফিজের কবিতার বইয়ে স্থান পেয়েছে বাংলার সুলতানের উদ্দেশে রচিত এ অপূর্ব কবিতাটি।

বাংলার এক সুলতান আর দূর ইরানের এক মহান কবির এই সম্পর্কে তোমরা খুবই চমৎকৃত হচ্ছো, তাই না!

আসলেও তা–ই ঘটেছিলো। গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্‌র সাথে হাফিজের এই বন্ধুত্বের কথা হাফিজের কাব্যে অমর হয়ে আছে।

আর এ ভাবেই বাংলাদেশ অমর হয়ে আছে ইরানের শ্রেষ্ঠ কবির কবিতায়।

তোমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, সুলতান কি নিয়ে কবিতার এই লাইনটি রচনা করেছিলেন!

তিনটি মেয়ে কাজ করতো সুলতানের মহলে। সুলতানের খিদ্‌মত করতো। সেবা–শুশ্রূষা করতো। সুলতান তাদের খুবই স্নেহ করতেন।

একবার হলো কী, সুলতান গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্‌ কঠিন অসুখে পড়লেন। ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, মেয়ে তিনটি পালা করে সুলতানের সেবা–শুশ্রূষা করতে লাগলো।

মেয়ে তিনটির একজনের নাম সরভ, একজনের নাম গুল্‌ আর একজনের নাম লালা।

সুলতানের বিশ্বাস হলো, তিনি আর বাঁচবেন না। তিনি মেয়ে তিনটিকে বললেনঃ আমি যদি মারা যাই তোমরা তিনজনে আমার দাফনের ইন্তেজাম করবে।

কিন্তু আল্লাহ্‌র কী মর্জি, সুলতান ধীরে ধীরে সেরে উঠলেন। তখন কেউ কেউ এ মেয়ে তিনটিকে মুর্দা–ফরাশ বলে ঠাট্টা–মশ্‌করা করতে লাগলো। সুলতান এ খবর

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

পেয়ে ওদেরকে খুশি করার জন্যে একটি কবিতার লাইন লিখলেন। চরণটিতে ওদের তিনজনের নামই জুড়ে দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনটি আর মেলাতে পারলেন না।

তখন তিনি ইরানের কবি হাফিজের শরণ নিলেন।

তিনিই কি কেবল ইরানের কবির খবর রাখতেন? না, এই কবি–সুলতানের গুণের কথাও ছড়িয়ে পড়েছিলো চারদিকে। হাফিজ তাঁর তা'রীফ করে কবিতা লিখেছেন, আরো কবি তাঁর তা'রীফ করেছেন তাঁদের কাব্যে।

বিদ্যাপতির কথাই ধরো না। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। বড়ো হলে তোমরা বিদ্যাপতির কথা অনেক জানতে পারবে। গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্‌র তিনি একজন বড়ো ভক্ত। তিনিও সুলতানের উচ্ছ্বসিত তা'রীফ করেছেন তাঁর কাব্যে। বিদ্যাপতি তাঁকে বলেছেন 'যুগপতি'।

'যুগপতি' গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্ । এর মানে কী?

গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্ জামানার সুলতান তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ রাজা।

তোমরা বুঝতেই পারছো বিদ্যাপতি আর গিয়াস উদ্‌দীনের মধ্যে কতো ভাব ছিলো।

এই সময়ের আরো একজন বড়ো কবি কৃত্তিবাস। বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের কতো আদর। মূল রামায়ণ ছিলো সংস্কৃতে লেখা। এ জন্যে বাঙালী পাঠক রামায়ণ পড়তে পারতো না। গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্‌র উৎসাহ আর প্রেরণায়ই নাকি বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন কৃত্তিবাস। এর থেকে তোমরা বুঝতে পারো, তিনি কতো উদার ছিলেন।

এক মুহূর্তের ইনসাফ

গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্‌র দরবারে জ্ঞানী–গুণীদের খুব কদর, দরবেশ–কুতুবদের খুব ইজ্জত। তিনি তাঁদের খুব তা'জীম করেন, তাঁদের পরামর্শ নেন,

facebook/@maktabatuttalamij

তাঁদের পরামর্শ মতো কাজ করেন—ইসলামের আইন-কানূন মতো দেশ শাসন করেন।

সেকালের একজন মশহুর দরবেশ ছিলেন আলাউল হক। তাঁর পুত্র নূর-কুতুব-ই-আলম গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্‌র সমবয়সী; তাঁরা দু'জন একসংগে পড়াশুনা করেন। নূর-কুতুব-ই-আলমও কামিল মানুষ।

আর একজন কামিল মানুষ মুজাফ্‌ফর শাম্‌স বলখী। তিনি বিহারের লোক। তিনি কেবল কামিলই নন, তিনি খুব বড় পণ্ডিত, খুব বড় আলিমও। অনেক তাঁর পড়াশোনা, গভীর তাঁর জ্ঞান। ইসলামের সব বিষয়ে তিনি জানেন।

সুলতানের দরবারে আরো অনেক জ্ঞানী-গুণী এবং দরবেশের সমাবেশ। কিন্তু এ দু'জনের প্রভাবই সুলতানের উপর বেশি। সুলতান এঁদেরকে খুবই তা'জীম করেন, তাঁরাও চান সুলতান যেনো খাঁটি মুসলমানের মতো চলেন, সুলতান যেনো ইসলামের আইন-কানূন মতো বিচার-আচার করেন, রাজ্য চালান।

একবার মুজাফ্‌ফর শাম্‌স বলখী সুলতানকে লিখলেন ঃ এক মুহূর্তের ইনসাফ তো ষাট বছরের ইবাদত বন্দেগীর চেয়েও বড়ো।

কতো বড়ো কথা তাই না?

মানুষ ষাট-সত্তর বছর বাঁচে। ষাট-সত্তর বছর মানে সারা জীবন—সারা জীবনের ইবাদতের চাইতে এক মুহূর্তের সুবিচার বড়ো।

আর কুরআন কী বলেছে? ইনসাফ করতে গিয়ে যদি নিজের ক্ষতি হয়, আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতি হয়, এমন কী বাপ-মার ক্ষতি হয়, তবু ইনসাফ করতে হবে।

কুরআন-হাদীসের এই শিক্ষা মতোই বিচার করেন, দেশ চালান গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্‌। আইনের কাছে সবাই সমান। সুলতানের জন্যে এক আইন, আর প্রজার জন্যে অন্য আইন হতে পারে না। আল্লাহ্‌র আইন সকলের জন্যেই এক।

একবার সুলতান তীর প্র্যাক্‌টিস করছিলেন। সেকালে তীর ছিলো যুদ্ধের একটি অস্ত্র। যিনি দেশ চালাবেন তাঁকে যুদ্ধবিদ্যাও শিখতে হবে।

facebook/@maktabatuttalamij

সুলতান টেরও পেলেন না—তাঁর একটি তীর গিয়ে বিঁধলো বহুদূরে, এক বিধবার পুত্রের গায়ে।

facebook/@maktabatuttalamij

দেশে বিচার করেন কাযী। মানুষ বিচারের জন্যে কাযীর কাছেই যায়। বিধবাটি কাযীর কাছে গিয়ে বিচার চাইলো, তার পুত্রকে তীর মেরে জখম করা হয়েছে, এজন্যে সে অপরাধীর শাস্তি চায়।

facebook/@maktabatuttalamij

কাযীর নাম সিরাজ উদ্‌দীন। সিরাজ উদ্‌দীন মুশকিলে পড়লেন।

মুশকিলটা কী? তিনি যদি দেশের আইন মতো বিচার না করেন, যদি সুলতানের পক্ষে রায় দেন, আল্লাহ্‌র কাছে তিনি অপরাধী হবেন; আর যদি আইন মতো বিচার করেন সুলতানকে সমন পাঠাতে হবে আদালতে হাযির হওয়ার জন্যে। কাজ বড়ই কঠিন। অতো বড়ো রাজ্যের সুলতান, তাঁকে এসে দাঁড়াতে হবে অপরাধীর কাঠগড়ায়।

দু'দিকেই মুশকিল।

কিন্তু সিরাজ উদ্‌দীন যে কাযী, তিনি যে বিচারক, তাঁকে ভয় পেলে চলবে কেন! তাঁকে আল্লাহ্‌র আইন মতোই বিচার করতে হবে।

কাযী সিরাজ উদ্‌দীন তখন কী করলেন? তিনি সুলতানের নামে সমন জারি করলেন। সমনসহ এক পেয়াদাকে তিনি পাঠালেন সুলতানের কাছে। তিনি নিজে গিয়ে বসলেন কাযীর আসনে, আর তাঁর আসনের নিচে রেখে দিলেন একটি বেত।

এদিকে শাহী মহলের কাছে পৌঁছে পেয়াদার বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করতে লাগলো। সুলতানের উপর কেউ সমন জারি করতে পারে, পেয়াদা কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। শাহী মহলে যে কেমন করে ঢুকবে আর সমনই বা সে কোন্‌ সাহসে জারি করবে।

কিন্তু উপায় নেই। কাযীর আদেশ–। সমন তাকে জারি করতেই হবে।

তখন সে করলো কি—শাহী মহলের প্রবেশ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে আযান দিতে লাগলো।

অসময়ে আযান দিচ্ছে—কে এই মুয়াজ্জিন! সুলতানের ঔৎসুক্য হলো, তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন।

ঃ এ অসময়ে আযান দিচ্ছো কেন? সুলতান জিগ্‌গাসা করলেন।

ঃ আমি মহামান্য কাযীর কাছ থেকে সমন নিয়ে এসেছি—পেয়াদা ভয়ে ভয়ে বললো।

facebook/@maktabatuttalamij

ঃ সমন! সুলতান ভ্রূ কুঞ্চিত করেন, কার জন্যে সমন?

ঃ জাহাঁপনা, সমন আপনার জন্যেই, কিন্তু ভয় পাচ্ছিলাম কেমন করে এখানে ঢুকি। তাই আযান দিতে শুরু করি।

ঃ আমার জন্যে সমন! সুলতান বিস্মিত হলেন।

ঃ জী, জাহাঁপনা—আপনাকে এখুনি আদালতে যেতে হবে, এক বিধবার ছেলের গায় আপনার তীর বিঁধেছে। আপনার বিরুদ্ধে বিধবা নালিশ এনেছে।

সুলতান এতোক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলেন। তিনি আর দেরি করলেন না। অপরাধ যখন করেছেন জবাবদিহির জন্যে তাঁকে কাযীর দরবারে যেতেই হবে। সুলতান একটি ছোট্ট তরবারি নিলেন—আর সেটি জুব্বার ভেতরে লুকিয়ে কাযীর দরবারে গিয়ে হাযির হলেন।

সুলতান এসেছেন—কাযী কিন্তু তাঁকে মোটেই খাতির করলেন না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন না, তা'যীমও করলেন না। সুলতান এই মুহূর্তে আর সুলতান নন—তিনি আসামী। আর আইনের কাছে সব আসামীই সমান।

কাযী বললেন ঃ আপনি জানেন, এই বিধবাটির ছেলের গায়ে আপনার তীর বিঁধেছে?

সুলতান বললেন ঃ জানতাম না, তবে এখন জানলাম। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

ঃ আপনি অপরাধী, কাযী গম্ভীর স্বরে বললেন, এই বিধবাটিকে খুশি করার চেষ্টা করুন। যদি সে আপনাকে মাফ করে দেয় এবং মামলা তুলে নেয়, ভালো, না হলে আইন মতো এর বিচার হবে।

সুলতান তখন কী করলেন? তিনি বিধবা মেয়েটিকে অনেক বোঝালেন ঃ তিনি ইচ্ছা করে তার ছেলেকে তীর মারেন নি। তিনি যখন তীর ছুঁড়ছিলেন তখন তিনি জানতেন না, বিধবার ছেলেটি কোথায় ছিলো।

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

সুলতানের কথায় বিধবাটি শান্ত হলো।

সুলতান তখন তাকে অনেক টাকা-কড়ি দিলেন।

কাযী বিধবাকে জিগ্‌গাসা করলেন ঃ তুমি কি খুশি হয়েছো?

বিধবাটি বললো ঃ হ্যাঁ বাবা, আমি খুশি হয়েছি।

কাযী সিরাজ উদ্‌দীনের আনন্দ দেখে কে! তিনি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আর সুলতানকে অভিনন্দন জানালেন।

সুলতানের বগলের নিচে লুকানো ছিলো তরবারি। সেই তরবারিটি বের করলেন তিনি। তারপর বললেন ঃ কাযী, আমি মুসলমান। আমি কুরআনের আইন মানতে বাধ্য। তাই আপনার সমন পেয়ে ছুটে এসেছি। আপনি যদি আইন মোতাবেক বিচার না করতেন, আমি কি করতাম জানেন?

কাযী সুলতানের মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন। কিছু বললেন না।

সুলতান তলোয়ারটা ডান হাতে উর্ধ্বে তুলে ধরে বললেন ঃ এ তলোয়ার দিয়ে ঘাড় হতে আপনার মাথাটা খসিয়ে দিতাম।

ঃ আর আপনি যদি বিচার না মানতেন আমি কি করতাম জানেন? সুলতানের চোখের ওপর চোখ রেখে কাযী বললেন।

ঃ কী করতেন? বললেন সুলতান।

কাযী তাঁর আসনের নিচ থেকে বেতখানা বের করলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! এ বেত দিয়ে আমি আপনাকে চাবকাতাম!

আদালতের হুকুম না মানলে বিচারক শাস্তিস্বরূপ পিঠে চাবুক মারতেন। সুলতান আসামী, সুলতানকেও কাযী সেই শাস্তি দিতেন। ইনসাফ করতে ভয় পান না কাযী।

কাযীর কথা শুনে সুলতান কি তাজ্জব বনলেন?

না।

তিনি কি রেগে আগুন হলেন?

না।

facebook/@maktabatuttalamij

তবে তিনি কী করলেন?

খুশি হয়ে কাযীর সাথে কোলাকুলি করলেন। তাঁকে অনেক টাকা-পয়সা এবং উপহার দিলেন। আল্লাহ্‌র কাছে দু'হাত তুলে শোকরিয়া জানালেন, তাঁর রাজ্যে এমন নির্ভীক কাযী রয়েছেন!

নূর কুতুব-ই-আলম ও মুজাফ্‌ফর শামস্‌ বলখী—এই দুই কামিল ও জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন তাঁর উপদেষ্টা, তাঁর পরামর্শদাতা। তাঁর একজন উযীর ছিলেন—খান-ই-জাহান। সুলতান তাঁর কথার খুব দাম দিতেন।

গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্‌ নিজে গুণী মানুষ । তিনি ইনসাফ পছন্দ করেন। কবি-সাহিত্যিকদের ভালোবাসেন। নিজেও কবিতা লেখেন, গযল লেখেন—আমীর-উলামা আর দরবেশদের সহবতে তিনি আনন্দ পান। তাঁরাও তাঁকে ভালোবাসেন।

তার চেয়ে বড়ো কথা, দেশের সাধারণ মানুষকে তিনি ভালোবাসেন। এজন্যে দেশে কতো শান্তি! তাঁর রাজ্যে ধন-দৌলতের অভাব নেই। কম পয়সায় সব জিনিস পাওয়া যায়। জিনিস-পত্রের দাম এতো সস্তা যে, শুনলে তোমাদের বিশ্বাসও হবে না।

তোমরা যখন বড়ো হবে তখন চীনা সফরকারীদের বিবরণ পড়বে—অনেক কিছু জানতে পারবে।

দেশ বিদেশের সাথে সম্পর্ক

তিনি তিনবার চীন দেশে দূত পাঠিয়েছিলেন। তখন চীন দেশের রাজা কে ছিলেন জানো? —য়ুংলো।

সুলতান প্রথম তাঁর দূত পাঠান ১৪০৫ সনে। তিন বছর পর আবার বাংলাদেশ থেকে দূত গেলো চীনে। শেষবারের মতো তিনি আবার দূত পাঠালেন ১৪০৯ সনে। আমাদের প্রেসিডেন্ট-মন্ত্রীরা আজকাল যেমন বিরাট দলবল নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর

facebook/@maktabatuttalamij

করেন, তেমনি এক ব্যাপার ঘটেছিলো সে বছর। বাংলাদেশের দূত ২৩০ জন কর্মচারী নিয়ে চীনে গিয়েছিলেন। সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন অনেক উপহার। চীনারাও এনেছিলো অনেক উপহার, বাংলাদেশের সুলতানের জন্যে।

বাংলাদেশ থেকে ফিরে চীনা সফরকারীরা অনেক কিছু লিখেছেন আমাদের সম্পর্কে। এসব কাহিনী তোমরা হয়তো একদিন পড়বে। তখন জানতে পারবে কত বড়ো শহর ছিলো সোনার গাঁ।

বড়ো হবে না! স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ছিলো যে—এই আজ যেমন ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী।

মক্কা—মদীনায় সাহায্য

এই সোনার গাঁ'র সোনার মানুষ গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্ একদিন স্থির করলেন শিক্ষা বিস্তারের জন্যে আরব দেশে মাদ্রাসা খুলবেন।

অবাক কাণ্ড, তাই না? আজকাল আরব দেশে কতো সম্পদ, কতো ধন-দৌলত! দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ এখন আরব দেশ। আরব দেশ এখন টাকা-পয়সা দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে। আরবের সম্পদ না পেলে এখন আমাদের চলে না।

কিন্তু আজ হতে প্রায় ৬০০ বছর আগের কথা—এ বাংলাদেশেরই এক সুলতান অনেক টাকা-পয়সা পাঠিয়েছিলেন আরব দেশে।

গিয়াস উদ্‌দীনের অনেক কর্মচারী ছিলেন । তাঁদের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন হাবশী—হাবশী মানে আবিসিনিয়ার মানুষ—লম্বা চওড়া কিন্তু দেখতে মিশমিশে কালো, আলকাতরার মতো রঙ। এই কর্মচারীটির নাম ইয়াকুত উনানী।

সুলতান ইয়াকুতকে বললেন ঃ শুনতে পেলাম মক্কা-মদীনার লোকেরা খুব কষ্টে আছে। ওরা আমাদের ভাইবোন। আমরা সুখে থাকবো আর ওরা কষ্ট পাবে, এ হতে

facebook/@maktabatuttalamij

পারে না। বাংলাদেশের সুলতানের তরফ থেকে ওদের জন্যে মদদ নিয়ে যাও তুমি। গিয়ে ওদের মধ্যে ভাগ করে দাও।

ইয়াকুত উনানী জিগ্‌গাসা করলেন ঃ আর কিছু করতে হবে জাহাঁপনা?

সুলতান বললেন ঃ হ্যাঁ, ওরা বড়ো গরীব। অভাবের দরুন ওরা লেখাপড়া করতে পারে না, অথচ লেখাপড়া শেখা হলো ফরয। ওদের লেখাপড়ারও ব্যবস্থা করতে হবে।

ঃ আর কিছু জাহাঁপনা? ইয়াকুত উনানী সুলতানের নিকট থেকে পুরো নির্দেশ পেতে চান।

সুলতান বললেন ঃ শুনেছি আশ্রয়ের অভাবে মুসাফিরেরা পথেঘাটে খুবই কষ্ট পায়। ওদের জন্যে তুমি সরাইখানা তৈরি করবে।

সরাইখানা। তোমরা হয়তো ভাবছো সরাইখানা আবার কী!

আজকালকার মতো তো তখন বড়ো বড়ো পাকা রাস্তা ছিল না, গাড়ী-ঘোড়া-ট্রেন ছিলো না। আর উড়োজাহাজ তো মাত্র সেদিন এলো। তখন মানুষ পথ চলতো হেঁটে, না হয় উটের পিঠে, গাধার পিঠে, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে। মাঠ-প্রান্তর পার হয়ে পায়ে হাঁটা সড়ক চলেছে, রাস্তা চলেছে। মনে করো, পথ চলতে চলতে বিয়াবান মাঠের মধ্যে হঠাৎ সন্ধ্যা হয়ে গেলো। তোমার এখন দরকার বিশ্রামের, তোমার শরীরটা একটু আরাম চায়, তুমি একটু শান্তিতে রাতটা কাটাতে চাও।

কিন্তু কোথায় আরাম করবে, বিশ্রাম করবে। রাস্তার পাশেই যদি কিছুদূর পরপর ছোট ছোট ঘর-দোর থাকে, সেখানে থাকে খাবার, পানি, থাকার ব্যবস্থা, অনায়াসেই তুমি রাতটা কাটিয়ে দিতে পারো। বিজন মাঠে রাস্তার পাশে মুসাফিরদের জন্যে তৈরি এ ধরনের ঘর-দোরকে বলা হয় সরাইখানা।

ইয়াকুতের সংগে গেলেন আরো একজন কর্মচারী, তাঁর নাম হাজী আব্বাস।

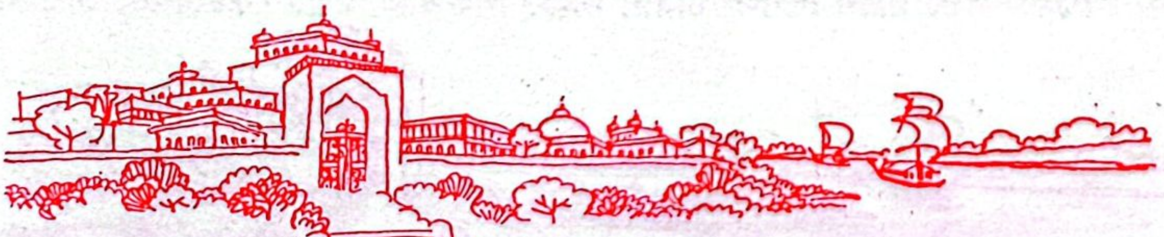

facebook/@maktabatuttalamij

সে সময়ে হাসান-বিন-অজ্‌লান ছিলেন মক্কার শেরীফ—শেরীফ মানে শাসনকর্তা। ইয়াকুত তাঁর হাতে পৌঁছালেন সুলতানের চিঠি। আর তার সাথে দিলেন সুলতানের তরফ থেকে পাঠানো টাকা-কড়ি, ইনাম-উপহার।

শেরীফ খুবই খুশি হলেন। বাংলাদেশের এক সুলতানের নিকট থেকে মদদ এসেছে। শেরীফের তাতে কতো আনন্দ। সাহায্য তো আসবেই। মুসলমান যে ভাই-ভাই। দু'দেশের বাসিন্দা হলে কী হবে—ভাষা ভিন্ন হলে কী হবে—ওরা যে একই নবীর উম্মত। একের দুর্দিনে অপরে তো পাশে এসে দাঁড়াবেই।

অতো টাকা-পয়সা পেয়ে শেরীফ কী করলেন? নিজে রাখলেন তিন ভাগের এক ভাগ। আর বাকি টাকা?

বাকি টাকা মক্কা আর মদীনার লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। মক্কা-মদীনায় যতো গরীব লোক ছিলো, যতো লেখাপড়া জানা লোক ছিলো, সবাই এ টাকার অংশ পেলো। এতো টাকা বিতরণ করা হলো যে, কেউই বাদ গেলো না।

মক্কার একটি স্থানের নাম বাব-ই-উম্মে হানী। 'বাব' মানে দরজা—উম্মে হানীর দরজা। সেখানকার দু'টি বাড়ি কিনে ফেললেন ইয়াকুত উনানী।

কি জন্যে? না, মাদ্রাসা স্থাপন করবেন, সরাইখানা তৈরি করবেন। মাদ্রাসার জন্যে আরো জমিও কিনলেন। বাড়ি দু'টি ভেঙে তৈরি করলেন মাদ্রাসাভবন।

এর জন্যে কতো টাকা খরচ হলো জানো? বারো হাজার সোনার মিস্‌কাল।

মাদ্রাসা তৈরির কাজ শুরু হলো ৮১৩ হিজরীর রমযান মাসে। আর শেষ হলো ৮১৪ হিজরীর মাঝামাঝি এসে।

তোমরা বড় হলে জানতে পারবে মুসলমানদের মধ্যে চারটি প্রধান মজ্‌হাব আছে। একেক মতের লোকের একেক মজ্‌হাব। যেমন-একটি মজ্‌হাবের নাম হানাফী, একটির নাম শাফেঈ, একটির নাম মালিকী, আর একটির নাম হাম্বলী। ইসলামের আসল কথায় সব মজ্‌হাবের একই মত। তবে ছোটখাটো ব্যাপারে কিছু মতভেদ আছে। মতভেদ মানে—একেক মজ্‌হাবের একেক মত।

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

অনেকে অবশ্য মজ্‌হাব মানে না। নবীর উম্মতের জামাত তো একটিই হবে। ছোটখাটো মতভেদ নিয়ে আবার আলাদা আলাদা মজ্‌হাব হবে কেন!

যাই হোক, সুলতানের নির্দেশে এই মাদ্রাসায় এই মজ্‌হাব চারটির বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলো। তার জন্যে উস্তাদ নিয়োগ করা হলো।

সে সময়ে আরবদেশে ছিলেন দু'জন ইতিহাসবিদ। ইতিহাসবিদ কাকে বলে? যাঁরা আগে যা হয়ে গেছে, বর্তমানে যা হচ্ছে, তা লিখেন, লিখে রাখেন।

এ রকমই একজন ইতিহাসবিদ হচ্ছেন তকী আল ফসিহ্। তাঁর জন্ম ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে আর মৃত্যু ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন এই মাদ্রাসার একজন উস্তাদ। তাঁর লেখা বিবরণ থেকে এসব কথা জানা যায়।

মাদ্রাসায় মোটমাট ছাত্র ছিলো ষাটজন। হানাফী মজ্‌হাবের কুড়িজন, শাফেঈ মজ্‌হাবেরও কুড়িজন। মালিকী ও হাম্বলী মজ্‌হাবের ছাত্র নেয়া হলো দশজন করে।

মাদ্রাসাটি যাতে নিজের আয়ে চলতে পারে তার দিকে নযর রাখা হলো। মাদ্রাসার ধারেকাছেই কেনা হলো দু'খণ্ড জমি, তা ছাড়া চারটি কুয়াও খরিদ করা হলো। কিনে এগুলি মাদ্রাসার জন্যে দান করা হলো।

কী উদ্দেশ্যে? এসবের আয় দিয়ে উস্তাদজীদের বেতন দেয়া হবে, ছাত্রদের খরচ বহন করা হবে, চাকর–বাকরদের খরচ চালানো হবে, বাতির তেল, পানির খরচ যোগানো হবে। এভাবেই মাদ্রাসাটি চালানোর ব্যবস্থা করা হলো।

মাদ্রাসা ভবনের সামনেই ছিলো একটি বাড়ি। মাদ্রাসার জন্যে বাড়িটি দরকার। তাই সেটিও কেনা হলো। তার জন্যে ব্যয় করা হলো পাঁচ শ' স্বর্ণ মিস্‌কাল।

কিন্তু কেবল মক্কার মাদ্রাসার জন্যে খরচ করলেই কি চলবে? মদীনার জন্যে কি কিছু করতে হবে না? ইয়াকুত উনানী জানতে চাইলেন।

সুলতান গিয়াস উদ্‌দীন বললেন ঃ আলবৎ। বাংলার সম্পদে মক্কার লোক অংশ পাবে আর মদীনার লোক অংশ পাবে না–এ হতে পারে না। তিনি হুকুম দিলেন— মদীনায়ও একটি মাদ্রাসা করো।

facebook/@maktabatuttalamij

মদীনার একটি স্থানের নাম বাব্‌-উল-ইসলাম। 'বাব্‌-উল-ইসলামে'র কাছেই একটি জায়গা—তার নাম 'হিসানুল আতিক'। এখানেই স্থাপন করা হলো মদীনার লোকদের জন্যে মাদ্রাসা।

তোমরা বুঝি খুবই বিস্মিত হচ্ছো, তাই না? মক্কা-মদীনায় মাদ্রাসা করেই সুলতান ক্ষান্ত হলেন না। কয়েকবারই তিনি মক্কা-মদীনার লোকদের জন্যে বাংলাদেশ থেকে পাঠান অনেক-অনেক উপহার।

মাদ্রাসা ও সরাইখানার জমি আর তার সাথে আরো কিছু জমির জন্যে শেরীফ কী পরিমাণ টাকা-কড়ি নিয়েছিলেন জানো?

বারো হাজার স্বর্ণ মিস্‌কাল।

সেদিন গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্‌ বাংলাদেশ থেকে স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন আরব দেশে।

তা ছাড়া ইয়াকুতের হাতে সুলতান দিয়েছিলেন আরো ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। কি জন্যে জানো?

আরব দেশে তো পানির খুব অভাব। পানির অভাবে ওরা খুবই কষ্ট পাচ্ছে! আরাফা নামক জায়গায় একটি খাল খনন করতে হবে। পানির এই অভাব দূর করার জন্যে ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠান বাংলার সুলতান।

আজ হতে সাড়ে ছয়শ' বছর আগে বাংলার এই সুলতান তাঁর ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন ইসলামের পবিত্র ভূমি মক্কা-মদীনার মদদের জন্যে, আরবের লোকদের শিক্ষার জন্যে, ওদের পথের কষ্ট, পানির কষ্ট দূর করার জন্যে। আমাদের জন্যে কতো গৌরবের কথা, আনন্দের কথা, তাই না?

অন্তিম শয্যায়

এই যে গিয়াস উদ্‌দীন আযম শাহ্‌, যাঁর উপদেষ্টা ছিলেন নূর কুতুব-ই-আলম, পরামর্শদাতা ছিলেন মুজাফ্‌ফর শাম্‌স বলখী, যাঁর উযীর ছিলেন খান-ই-জাহান,

facebook/@maktabatuttalamij

কাযী ছিলেন সিরাজ উদ্দীন, বিশাল ছিলো তাঁর রাজ্য। তিনি নিজেও ছিলেন জ্ঞানী। গান লিখতেন, গযল লিখতেন। দুনিয়ার জ্ঞানী ব্যক্তিদের খবর রাখতেন। দেশের মানুষকে সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। ইসলামের জন্মভূমি আরব দেশের মানুষের দুঃখ–কষ্টে তাঁর প্রাণ কাঁদতো।

পৃথিবীতে কেউই চিরকাল বেঁচে থাকে না। গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ্ও একদিন জান্নাতবাসী হলেন। আজ থেকে প্রায় ছয় শ' বছর আগের কথা। খৃষ্টীয় চৌদ্দ শ' দশ কিংবা এগারো সনে ইন্তিকাল করেন তিনি।

এই মহান সুলতানের কবর কোথায় আছে জানো? ঢাকা থেকে কয়েক মাইল দূরে সোনার গাঁয়।

ইফা-২০১২-২০১৩-প্র/২১১(উ)-৩,২৫০

facebook/@maktabatuttalamij